‘বাঙালিরা, আমার মনে হয়, প্যারাডক্স তৈরি করাতে ওস্তাদ। এটা বাঙালি প্রতিভা।’

উৎপলকুমার বসু

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

‘তোমার আকাশ তোমার বাতাস’। জনপ্রিয় এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হতো ফ্রেন্ডজ ৯১·৯ এফ এমে। এটি সঞ্চালনা করতেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ২০০৮ সাল নাগাদ অতিথি হিসেবে এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন উৎপলকুমার বসু। সৌমিত্র এবং উৎপলের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিলো তা এর আগে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়নি। আদম পত্রিকায় এই সংখ্যায় মূল্যবান সেই কথাবার্তা সাক্ষাৎকার হিসেবে প্রকাশিত হল।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: আজ আমরা ছোট আড্ডা দেব এবং সে আড্ডার বিষয়, বুঝতেই পারছেন, নিশ্চিতভাবেই রবি ঠাকুর। আজ যিনি এসেছেন এই আড্ডায় তিনি বাংলা কবিতায় বিরল নক্ষত্রের মধ্যে অন্যতম একজন, কম লেখেন কিন্তু যা লেখেন সেইসব লেখা চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকে। চৈত্র মাসে তিনি অতিথি হয়ে এসেছেন তাই সেই সূত্র ধরে আমরা মনে করেই নিতে পারি এই কবির সেই সুখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম ‘চৈত্রে রচিত কবিতা’। এরপর বোধহয়, কবির নাম বলার আর প্রয়োজন হবে না, তবু আলাপের খাতিরে জানিয়ে রাখি আজ আমাদের অতিথি উৎপলকুমার বসু। এসো উৎপল, ‘তোমার আকাশ তোমার বাতাস’ অনুষ্ঠানে তোমাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

উৎপলকুমার বসু: বলো, আর কী বলার আছে?

সৌমিত্র: বলার মানে, আজকে আমাদের বিষয়, বর্ষ শেষ। আর বছর ফুরনো নিয়েও তো তুমি কবিতা লিখেছ, দীর্ঘ কবিতা, ‘১৯৬২ শেষ হল’। এর হয়ত অন্য একটা প্রেক্ষিত রয়েছে তবু বর্ষ শেষ তো অবশ্যই একটা শেষ এবং আর একটা শুরুর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মুহূর্ত, সমুদ্রের তীরে দাঁড়ালে পায়ের নীচ থেকে সরে যায় ফেনামাখা ঢেউয়ের জল আর বালি। তোমার সঙ্গে কথা শুরুর আগে সেই কবিতাটার একটুকরো শুনে নেব

এবার শীতের বনে অপরাহ্ণ দ্রুত পড়ে এল।

এবার শীতের বনে অপরাহ্ণ চলে যায় দ্রুত।

এবার বৎসরান্তে প্রত্যেকের নাম আমি খাতায় লিখেছি।
তোমাদের সঙ্গে, বন্ধু, নতুন আলাপ হল,
তারো আগে অন্য বহু বন্ধুত্বকে মনে পড়ে

বস্তুত, বনের মধ্যে, নির্বাসনে, কাঠের বাড়িতে
সমসাময়িক বলে কিছু নেই,
যূথবদ্ধ হাঁস, পাখি, শিকারির আনাগোনা ছাড়া।
তাদের কর্তব্য বহু— খাদ্য আর খাদকের পরস্পর কর্তব্য, বুদ্ধির
প্রতিযোগিতাও আছে, শিকারির রাইফেল তেমনই মর্যাদাবান
গত বছরের মতো, শিকারির কার্তুজ তেমনই সন্ত্রাসবাদী গত
দশ বছরের মতো, মানুষের সভ্যতাও বন্যতার পাশাপাশি
পরিবর্ধমান গত সহস্র ঋতুর মতো—

ফুল তাই গন্ধে আজ আমাদের সতর্ক করেছে

মনে পড়ছে এই কবিতাটা?

উৎপল: এই কবিতাটার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। ১৯৬২ এর শেষ দিন আমি আর শক্তি দুজনায় এক ঘরে ছিলাম জঙ্গলের মধ্যে, খুব সম্ভবত চাইবাসা অঞ্চলে, বুরুড়ির পাহাড় টাহাড়, এইসব জায়গার কোনো ফরেস্ট বাংলোয়। দুটো খাটে আমরা শুয়ে আছি একটায় আমি আর একটায় শক্তি। শক্তি তখন অনেক কবিতা লিখছে, রাত্রি নটা-দশটা থেকে লিখছে চতুর্দশপদী, অনেকগুলো। এগারোটা-বারোটা নাগাদ আলো জ্বালিয়ে লিখছে। তো আমি বললাম, এই আলোটা নেভা। মাথার উপর আলো জ্বালিয়ে ঘুমানো যায়? শক্তি বলল, লেখ তো দেখি, আমার মতো কবিতা। দু-একটা সনেট পড়ে শোনাল, খুবই অসাধারণ সনেট। তো আমি বললাম দাঁড়া, আমিও লিখছে। কাগজ টেনে এনে আমি লিখলাম এই লেখাটা, '১৯৬২ শেষ হল', পড়েও শোনালাম। পারস্পরিক প্রশংসা ইত্যাদি হল। শক্তি আবার লিখতে বসল, এই করতে করতে ভোর হয়ে গেল।

সৌমিত্র: আজ যখন এসেছ তখন প্রাসঙ্গিক একটা কথা উত্থাপন করতে ইচ্ছে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে তোমরা যে কৃত্তিবাসের গোষ্ঠী সেইসময় তোমাদের ভিতরে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মনোভাব কী ছিল? তোমাদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কি সেভাবে আসতেন? তাকে কি তোমরা কোনোভাবে ডেকে আনতে চাইতে? নাকি একেবারে বিদ্রোহী হয়ে তাঁর কাছ থেকে সরে নতুন একটা কাব্যভঙ্গি একটা বাকশৈলী তৈরি করতে চাইতে? ঠিক কী ভাবতে?

উৎপল: সে তো অনেকদিন আগের কথা, আমাদের সবারই বয়স হয়েছে, স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ভুল হতে পারে। কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যা থেকে তিনজন সম্পাদক ছিলেন, আনন্দ বাগচী, দীপক মজুমদার এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তা তখন দীপক মজুমদারই ছিলেন রীতিমতো নায়ক, সে সকলের পিঠে হাত রেখে কথা বলত। সে লেখা চাইলে আর তা না দেওয়ার উপায় ছিল না। সে ছিল আশ্চর্য সম্পাদক। সে সকলের কাছে কবিতা নয়, কবিতার খাতা চাইত। সেখান থেকে সে পছন্দ করে ছাপাবে। বিরাট দাবি।

আমার মনে আছে, প্রথম সংখ্যা, তার আগে থেকে শঙ্খ ঘোষের কবিতার তিনটে খাতা ছিল, তার মধ্যে কফি হাউসে বসে আমি আর দীপক ঠিক করলাম, দীপকই ঠিক করত আমি হ্যাঁ হ্যাঁ বলে যেতাম, তা দীপক ঠিক করল, শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি' ছাপা হবে, বিখ্যাত কবিতা। সেটা দিয়েই কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা হল। তারপর দীপক তো অম্লান দত্তের কাছ থেকে লেখা চাইত সমর সেনের কাছ থেকে লেখা চাইত। একদিন সমর সেন কফি হাউসে আমাকে বললেন, আপনার বন্ধু দীপক? তিনি আমার কাছ থেকে লেখা চেয়েছেন, এই সেই লেখা। একটা গদ্য লেখা দিলেন। কৃত্তিবাসের প্রথম থেকেই ঠিক হয়েছিল, বড়দের কাছ থেকে গদ্য লেখা চাওয়া হবে আর সমবয়সীদের কাছ থেকে, কাছের লোকেদের কাছ থেকে কবিতা। এরপর ৪/৫ বছর পর, ১৯৫৩-৫৪ সাল নাগাদ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আসেন, শক্তি চট্টোপাধ্যায় আসেন। প্রথমদিকে কৃত্তিবাস কষ্ট করেই বের হয়েছে।

সৌমিত্র: রবীন্দ্রনাথ সমন্ধে তোমাদের মনোভাব কী ছিল?

উৎপল: রবীন্দ্রনাথ সমন্ধে আমাদের খুব বেশি সংশ্লেষ বা কনসার্ন ছিল না, কিছুটা তাঁর গান সমন্ধে ছিল। আমাদের মধ্যে ছিল জীবনানন্দ, ভীষণভাবে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে ধরেই নিয়েছিলাম, এতো ঘরের কবি, একে নিয়ে খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা না করলেও চলে। এতো হাতেই রয়েছে।

সৌমিত্র: আর খানিকটা মনে হত কি, রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জীবনে এত বেশি করে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, এখান থেকে বাইরে কী করে যাওয়া যায়? যেতে হবে।

উৎপল: মনে হত ঠিকই, কিন্তু তখন যেহেতু জীবনানন্দ এসে গেছেন তাঁর হাত ধরে আমরাও। দ্বিতীয় কথা কী শব্দব্যবহার কী চিত্রকল্প ব্যবহার সবকিছুতেই জীবনানন্দ ছিলেন অত্যন্ত আকর্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে বিশেষ করে ছিলেন গানে। আমাদের মনে হত রবীন্দ্রনাথ তো ঘরোয়া ব্যাপার, মাসি পিসি বাবা ঠাকুর্দার ব্যাপার, ওঁরাই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ করতেন। রবীন্দ্রনাথ একটা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার ছিলেন। ওই জন্মদিন পালন, ফুল, বেলপাতা।

সৌমিত্র: তোমাদের মধ্যে এমনকী আমরাও যারা তোমাদের আশেপাশে থাকতাম একটা প্রতিষ্ঠানবিরোধী ঝোঁক ছিল...

উৎপল: আমরা খুবই অপছন্দ করতাম। আমরা কেউই বাড়িটাড়ির খবর রাখতাম না, বাবা কী করেন এইসব খবর, আমরা নিজেরাও নানারকম শিক্ষার স্তর থেকে এসেছিলাম, আমি বিজ্ঞান পড়েছি, আমাদের বন্ধু শরৎ চ্যাটার্জ অ্যাকাউনটেন্সি পড়েছে, শক্তি কী পড়েছে তা অবশ্য চিরকালের রহস্য (হো হো হাসি)।

আমরা কেউই বাড়িটাড়ির ব্যাপারে কোনো মাথা ব্যথা ছিল না, রবীন্দ্রনাথও ওই অবস্থায় ছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে আমাদের অন্যরকম চিন্তাভাবনা ছিল, ওইসময় ৬১ সাল-টাল নাগাদ ওই ১০০ বছর না কী একটা হল না, চারধানে তখন খুব প্রচার, গান হচ্ছে, নাটক, সৌমিত্র, তুমি ভালোভাবেই জানো, রক্তকরবী বা সেইসময় স্টেজের নাটক... অবশ্য সেইসময় আমাদের কাছে আরও একজন স্মরণীয় ছিলেন, তিনি রবীন্দ্রবিরোধী, ব্রাহ্মবিরোধী, তিনি কমলকুমার মজুমদার। তিনি এবং জীবনানন্দ দাশ, এই দুজনের পাল্লায় পড়ে বখে যাওয়া বলতে যা বোঝায় তাই হয়েছিল আমাদের।

সৌমিত্র: রবীন্দ্রনাথ সেখানে বাঁচাতে আসেননি।

উৎপল: রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই, অন্তত সেসময়, ভেবেছিলাম ঠাকুরদা বাবা মা, মাসি পিসিদের ব্যাপার। স্কুল কলেজের দিদিমণিদের ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ মানে পঁচিশে বৈশাখ, ফুল, বেলপাতা, মিষ্টির প্যাকেট এইসব। পরবর্তীকালে যখন উত্তেজনা কমতে লাগল, ৬১ সালের উত্তেজনা, আমাদেরও বয়স বাড়ল, সেসময়, ৬৫-৬৬ নাগাদ গানটা খুব আকর্ষণীয় মনে হত। ছবি আঁকিয়েদের কাছে ছবি।

সৌমিত্র: গানের কথা তুমি বারবার বলছ। জানতে ইচ্ছে হচ্ছে তোমার প্রিয় কিছু রবীন্দ্রনাথের গানের কথা বলবে? কয়েকটা? তাহলে 'তোমার আকাশ তোমার বাতাস' অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের শোনাতে পারি। একটা বলা তো দুঃসাধ্য, কয়েকটা বলো।

উৎপল: হ্যাঁ, একটা বলা দুঃসাধ্য। আর তাছাড়া সকালে যে গানটা ভালো লাগল বিকেলে ভালো লাগে না, আবার হয়ত রাত্রে ভালো লাগল, এভাবেই চলছে সারাদিন। তবে যেহেতু বর্ষশেষ, বসন্ত কাল, আসতে আসতে ভাবছিলাম, কয়েকটা গানের কথা, এই সব গান তিনি কীভাবে লিখেছিলেন, ঠিক যেন ভর করা অবস্থায় লিখেছেন, যা মনে আসছে লিখেছেন তার পর যা হবার হবে। আমার একাট গানের কথা খুব মনে আসছে, 'বসন্ত সে যাইত হেসে যাওয়ার কালে'। বিস্ময়। আমরা তো জানি যাওয়ার সময় কাঁদতে কাঁদতে যায়। আর একটা গান, মনে করো, 'কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও' শেষে 'দাও মুছে'। এটা একটা অদ্ভুত প্যারাডক্স। 'দাও' শেষে আবার মুছে চলে যাও। যখনই পজিটিভ কোনো কথা বলছেন তারপরই যাও। আর একটা গান 'বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক', তারপর ধরো 'চলে যায় বসন্তের দিন চলে যায়'। অসাধারণ! আর একটা খুব প্রিয় গান 'পাখি আমার নীড়ের পাখি'।

সৌমিত্র: এখানে রবীন্দ্রনাথের গান একেবারে আধুনিক কবিতার জায়গায় চলে যাচ্ছে।

উৎপল: তারপর ধরো, 'এই শুধু অলস মায়া', রবীন্দ্রনাথ যখন কাজ করতে পারছেন না, আলসেমি করছেন তখনও তাকে প্রোডাক্টিভ করে তুলছেন আবার বিরূপ মন্তব্যও করছেন।

আলসেমি করা ঠিক নয়, 'অলস মায়া' আমাদের আরো কাজ করা উচিত এইসব। এ প্রতিভার কোনো তুলনা হয় না, কোথাও নেই,আমি অন্তত দেখিনি।

সৌমিত্র: তোমার কাছ থেকে তোমার পছন্দের কয়েকটা গানের কথা শুনে ভালো লাগল। এখান থেকে নির্বাচন করে আমরা শ্রোতাদের শুনিয়ে দিচ্ছি। আশা করি, তাদেরও ভালো লাগবে।

...

(রবীন্দ্রসংগীত)

'কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও...'

সৌমিত্র: আচ্ছা উৎপল, এবার তোমার কাছ থেকে একটু অন্য ধরনের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমি যতদুর জানতাম, শান্তিনিকেতনে তোমার একটা বাড়ি ছিল, এখনও হয়ত আছে। তো সেখানে তুমি মাঝে মাঝেই যেতে, বহু সময় কাটিয়েছ সেখানে। একটা জনশ্রুতি আছে, বোলপুর স্টেশন থেকে নেমে শান্তিনিকেতনের পথে হাঁটতে শুরু করলে টের পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র আছেন। তা তুমি তোমার বাড়িতে কখনও তা টের পেয়েছ?

উৎপল: করিনি, করলে তা খুব ভয়ের ব্যাপার হত। (হাসি)। শান্তিনিকেতনে আমার একটা ছোট ঘর ছিল, ধনী লোকের আউট হাউস সেটা, ওখানে আমি বসে কাজ করতাম। ওই ঘর ছিল আমার পালিয়ে যাওয়ার জায়গা। তবে রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি না পড়লেও, প্রথমদিকে বলব না, মাঝের দিকে পড়েছি। খুব মনে পড়ে, একটা গাছতলায় বসে গান গাইছে একটা দল, আর একটা হয়ত অন্য একটা গাছতলায়। খুব খোলামেলা ব্যাপার ছিল।

সৌমিত্র: কলকাতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

উৎপল: এখন তো চারধারে কাঁটাতার আর জাল। এদিকে হাঁটা যাবে না, এইসব। রবীন্দ্রনাথ শুনেছি, এসবের খুব বিরোধী ছিলেন। তিনি নাকি চাইতেন না, কোনো বাড়ি গাছের থেকে উঁচু হোক।

সৌমিত্র: বড় বড় বাড়িও পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, অন্তরঙ্গতা সেখানে নষ্ট হয়ে যায়।

উৎপল: আশ্চর্যের কথা বলছি, কতটা ঠিক বা ভুল তা জানি না, যেবছর আমেরিকার এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং খোলা হয়, তৈরি হয়েছিল অবশ্য ৪/৫ বছর আগেই, সেবছর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটা মাটির বাড়ি 'শ্যামলী' তৈরি করেন। এতেই বোঝা যায়, দৃষ্টিভঙ্গির কতটা পার্থক্য। এম্পায়ারের স্থাপত্য আর 'শ্যামলী'র স্থাপত্য নিয়ে তুলনামুলক আলোচনা করাই যায় কিন্তু বোঝা যায়, দৃষ্টিভঙ্গির কতটা তফাৎ।

(রবীন্দ্রসংগীত)

'দিন পরে যায় দিন, বসি পথপাশে...'

সৌমিত্র: আচ্ছা তুমি তো কাজের সূত্রে বা লেখার সূত্রে শান্তিনিকেতনে যেতে, একটা কথা বলো তো, রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রভাব বা উপস্থিতি তোমার কবিতায় আছে কি? এসেছে কি? নাকি একেবারেই আসেনি। এ বিষয়ে যদি একটু বলো।

উৎপল: বলা খুব কঠিন, আসলে রবীন্দ্রনাথ এতরকম কাজ করেছেন, তার মধ্যে গান একটা বলতে পারি, গান বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হয় না, আরও একটা সমান মাত্রায়, সেটা প্রবন্ধ। আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলব, এ দুটোই আমাকে বেশি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ অবাক হয়ে যাই, ২০০৭ সালেও সেগুলির রেলিভেন্স। কত বড় প্রতিভাধর হলে ভাবতে পারা যায়, যার ১০০ বছর পরও রেলিভেন্স থাকে। সচরাচর তো থাকে না। আর গানের কথা কী বলব? মনের ভাবের যাবতীয় প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের গান।

সৌমিত্র: একদিক থেকে তো তিনিই সাহিত্যের সবচাইতে বড় বেদিটা তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁকে তো মনে পড়বেই। অনেক সময় অজান্তেও তো আমার মনের ভিতর রবীন্দ্রনাথ এসে পড়েন। আমরা হয়ত তাঁর কাছ থেকে সরে যেতে চাই কিন্তু যখন আমাদের আরো একটু পরিণতি আসে তখন বুঝতে পারি ভাবুক হিসেবে ভাবনার দিক থেকে তিনি কতরকম করে ভেবেছেন এই ভদ্রলোক।

উৎপল: কতরকম করে তো ভেবেইছেন তবে গানের দিক দিয়ে সবচাইতে বিস্ময় লাগে তিনি গানের ভিতর প্যারাডক্স তৈরি করেছেন, ধাঁধা। যেমন ধরা যাক, 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে' এ গানটার কথাগুলো ভয়ের, ভীষণ ঝড় আসছে, ঘরে চলে আয় এইসব, কিন্তু সুরটা ভয়ংকর আনন্দের। তিনি বলছেন, এইসময় বেরিয়ে পড়। আমার খুব অবাক লাগে এই দুটোকে তিনি একজায়গায় উপস্থিত করলেন কী করে?

সৌমিত্র: 'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে', দেখে মনে হয় ভয়ংকর কিছু আসছে কিন্তু তা নয়, আশ্চর্য গম্ভীর মন্দ্র একটা আহ্বান।

উৎপল: বাঙালিরা, আমার মনে হয়, প্যারাডক্স তৈরি করাতে ওস্তাদ। এটা বাঙালি প্রতিভা।

সৌমিত্র: আর বাঙালি প্রতিভার চূড়ান্ত নিদর্শন তিনি। রবীন্দ্রনাথ।

উৎপল: একেবারে, কোনো সন্দেহ নেই।

সৌমিত্র: এটা তুমি আশ্চর্য কথা বলেছ। এই প্যারাডক্স। আচ্ছা আমরা এবার শুনে নিই গানটা।

(রবীন্দ্রসংগীত)

'নীল নবঘন আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে...'

সৌমিত্র: সত্যি তোমার সঙ্গে আড্ডাটা ফুরিয়ে আসছে আমাদের। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি এলে আমরা ভীষণ খুশি হলাম। আশা করি 'তোমার আকাশ তোমার বাতাস' অনুষ্ঠানের জন্য তোমাকে আবার ডাকতে পারব। তখন কথা হবে।

উৎপল: তুমি আবার আমাদের কী ধন্যবাদ দেবে? (হাসি)।

আচ্ছা খুব সুন্দর। খুব ভালো।

...

(রবীন্দ্রসংগীত)

'চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন চলে যায়...'